বুলেটিন নং: ২১
বর্ষ ৮ ॥ সংখ্যা ২
প্রকাশ কাল: ৫ সেপ্টেম্বর ২০০২
শুভেচ্ছা মূল্য: ৮ ৫ ॥ $2

THE SWADHIKAR স্বাধিকার

স্বাধিকার কিনুন
স্বাধিকার পড়ুন
আন্দোলনে সামিল হোন

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) -এর মুখপত্র

দুই পার্টির মধ্যে ঐক্য ও সমঝোতার বিরোধীতা কার স্বার্থে?

সত্যদর্শী

পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে যে দ্বন্দ্ব সংঘাতময় পরিস্থিতি জারি রয়েছে তার জন্য সবাই উদ্বিগ্ন। সবার প্রশ্ন পার্বত্য চট্টগ্রামের ভবিষ্যত কোনদিকে? আমরা কি নিজেরাই হানাহানি করে আত্মধ্বংস ডেকে আনবো? জনগণের মৌলিক দাবিগুলো আদায়ের জন্য যুক্তভাবে আন্দোলন না করে কেন নিজেদের মধ্যে মারামারি করে শক্তি ক্ষয় করা হচ্ছে? এভাবে কি সরকারকে লাভবান করা হচ্ছে না? যারা জনগণের স্বার্থ ও অধিকারের কথা বলে ও জনগণের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করছে বলে দাবি করে তারা কেন জনগণের স্বার্থে ঐক্য ও সমঝোতা করতে ভয় পাবে? এ প্রশ্নগুলো এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল মহলের। এ প্রশ্ন বিদেশে বসবাসরত সকল জুম্মদেরও। এমনকি জুম্ম জনগণের জন্য সহানুভূতিশীল আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও পার্বত্য চট্টগ্রামের গৃহযুদ্ধ-প্রায় পরিস্থিতির জন্য যথেষ্ট উদ্বিগ্ন।

ন্যূনতম যাদের বোধশক্তি রয়েছে, যাদের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেনি অথবা যারা দালাল রূপে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ সরকারের কাছে বন্ধক দেয়নি, তারা বোঝেন যে, নিজেদের মধ্যে হানাহানি চলতে থাকা মানে আত্মধ্বংস ডেকে আনা এবং তাতে সরকার ও সেনাবাহিনীরই লাভ। পুনরুক্তি হলেও বলে রাখা ভাল, ইউপিডিএফ কোনদিন সংঘাত ও হানাহানি চায়নি, এখনো চায় না। ইউপিডিএফ বহু আগে থেকে জেএসএস-এর কাছে ঐক্য ও সমঝোতার প্রস্তাব দিয়েছে ও তার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সর্বশেষ গত বৈসাবি উপলক্ষে পার্টির পক্ষ থেকে আবারো নতুনভাবে ঐক্য ও সমঝোতার আহ্বান জানানো হয়েছে। এ আহ্বান সম্বলিত পোষ্টার ও হ্যান্ডবিল প্রচার করা হয়েছে। আজ পর্যন্ত দেশ বিদেশের অনেকে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছেন। ইউপিডিএফ সেই প্রস্তাবে সম্মত হলেও তাতে জেএসএস-এর একগুঁয়েমির কারণে ঐক্য ও সমঝোতার লক্ষ্যে উভয় পার্টির মধ্যে অর্থপূর্ণ কোন আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

জেএসএস-এর মধ্যেও কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন দেশপ্রেমিক অনেকে আছেন যারা আদতে হানাহানি চান না। জানা যায়, তারা ইউপিডিএফ-এর সাথে সমঝোতায় আগ্রহী। নিজেদের মধ্যে হানাহানি হলে যে গণশত্রুদেরই লাভ তা তারা ভালো করেই বোঝেন। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো তারা সংখ্যায় বেশি হলেও জেএসএস-এ তাদের মতামত প্রাধান্য পায় না। এর কারণ জেএসএস নামক পার্টির মধ্যে গণতন্ত্রের ছিটেফোঁটাও নেই। সেখানে রয়েছে স্বৈরাচারিতা ও স্বেচ্ছাচারিতা। এক ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছাই সেখানে আইন। সংখ্যাগুরুর মতামতের কোন দাম এই পার্টির মধ্যে নেই। এই পার্টির পক্ষ হয়ে যারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'প্রচারণা' চালান, তারা প্রবাসী জুম্মদেরকে কাছে এই তত্ব বিক্রি করতে চান যে, যে জাতি এখনো স্বাধীনতা বা অধিকার অর্জন করেনি, যে জাতি এখনো সংগ্রামরত, সে জাতির গণতন্ত্র দরকার নেই। গণতান্ত্রিক রীতি নীতি অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরী নয়। কাজেই জেএসএস হচ্ছে এমন একটি পার্টি যা পরিচালিত হয় পার্টির সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিটির ইচ্ছা অনিচ্ছার ভিত্তিতে। জেএসএস-এর মধ্যে যদি ন্যূনতম গণতান্ত্রিক আচার আচরণ অনুসরণ করা হতো, তাহলে বর্তমানে যা ঘটছে তা সম্ভব হতো না। এমনকি, সরকারের সাথে যে চুক্তি সন্তু লারমা জেএসএস-এর পক্ষে স্বাক্ষর করেছেন, সেই চুক্তি সম্পর্কে যদি পার্টির অভ্যন্তরে সকল স্তরে নেতা কর্মি মহলে আলোচনা সমালোচনা হতো, তাহলে পরিস্থিতি অন্য রকম হতো। চুক্তি স্বাক্ষর করা না করা ব্যাপারে জেএসএস এর মধ্যে গণতান্ত্রিকভাবে কোন আলোচনাই হয়নি। তাদের পার্টির বাইরের লোকজন ও সংগঠনের মতামত নেয়াতো দূরের কথা। এমনকি, চুক্তিতে কি লেখা আছে তা স্বাক্ষরের আগে জেএসএস-এর শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন ছাড়া কেউ জানতেন না। আলোচনা কোন দিকে যাচ্ছে না যাচ্ছে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে সম্পর্কে জেএসএস নেতৃত্ব তাদের কর্মিদের ও সমগ্র জনগণকে অন্ধকারে রেখেছিল। এটা তারা করেছিল, কারণ যদি তাদের পার্টি কর্মি ও জনগণ জানতে পারেন চুক্তিতে আসলে কি লেখা আছে, তাহলে তারা তা বিরোধীতা করতেন। ফলে তা হতো আত্মসমর্পন ও আন্দোলন বন্ধক দেয়ার বিরুদ্ধে একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের যাতে মুখোমুখি হতে না হয়, সেজন্য জেএসএস নেতৃত্ব অত্যন্ত কৌশলে চুক্তির বিষয়বস্তু সকলের কাছ থেকে গোপন রেখেছিল। তারা জনগণের নাম ভাঙিয়ে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে, অথচ জনগণকে তারা এ ব্যাপারে কিছুই জানায়নি। জেএসএস-এর পক্ষে তারা সরকারের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছে ও চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, অথচ আলোচনা ও চুক্তি সম্পর্কে তারা সাধারণ কর্মি ও সদস্যদের কিছুই জানায়নি। স্বৈরাচারি কায়দায় যারা পার্টি পরিচালনা করেন, তারা ঠিক এ রকমই আচরণ করে থাকেন। জনগণ ও সাধারণ কর্মিদের মতামত তাদের কাছে অর্থহীন। জনগণের স্বার্থ, জাতীয় স্বার্থ, সামগ্রিক পার্টি স্বার্থ তাদের কাছে গৌন ব্যাপার। জেএসএস -এর স্বৈরাচারী নেতৃত্ব যদি জনগণের সামগ্রিক স্বার্থকে প্রাধান্য দিতেন, তাহলে ইউপিডিএফ-সহ জনগণের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আত্মঘাতি সংঘাত ও হানাহানি বন্ধ করে ঐক্য ও সমঝোতা স্থাপন সম্ভব হতো। কিন্তু ক্ষমতা ও গদির মোহ এমনই যে, যার এই মোহ একবার পেয়ে বসেছে সে আর জনগণের স্বার্থকে দেখতে পায় না। সে হয়ে যায় একচোখ কানা। তখন সে কেবল নিজের স্বার্থকেই দেখতে পায়। দুঃখজনক, ব্যাপার হলো এই যে, এক সময় সংগ্রামের মধ্যে থাকলেও বর্তমানে স্বৈরাচার-দুষ্ট জেএসএস নেতৃত্বের মধ্যে এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষমতা ও গদির দিকে চোখ রেখেই তাদের যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টি আরো বেশি পরিস্কার হয়ে যাবে।

আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় ছিল তখন জেএসএস নেতৃত্ব চুক্তি বাস্তবায়ন না করার জন্য কেবল আওয়ামী লীগ সরকারের একটি অংশকে দায়ি করেছিল। তাও অস্পষ্ট ও খেয়ালীভাবে। চুক্তি বাস্তবায়ন না করার জন্য তারা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেনি। বরং তার ওপর অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল বলে তারা সাক্ষাতকারে বলেছিল। কিন্তু হাস্যকর ব্যাপার হলো, যখনই সরকার পরিবর্তন হলো এবং বিগত নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি ক্ষমতায় আসলো, তখন হঠাৎ করে জেএসএস নেতৃত্বের বোলচাল পাল্টে গেলো। তারা এবার আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার চৌদ্দ গোষ্ঠি উদ্ধার করতে লাগলেন। কারণ, যেহেতু আওয়ামী লীগ আর ক্ষমতায় নেই, সুতরাং তাদেরকে গালমন্দ করা এখন নিরাপদ। অপরদিকে তারা নতুন সরকার রুষ্ট হয় এমন কোন আচরণ দেখাচ্ছেন না। একই চালাকি করে তারা বলে বেড়াচ্ছেন যে, বর্তমান বিএনপি-জামাত জোট সরকারের একটি অংশই চুক্তি বাস্তবায়নে বিরোধীতা করছে। সেই অংশ কারা, কি তাদের চেহারা, কি তাদের মতলব তা তারা খোলাখুলি কিছু বলছেন না। এমনকি, বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতারোহনের পর পরই যখন চুক্তির বরখেলাপ করে উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে একজন অপাহাড়িকে নিয়োগ দেয় এবং প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিজের কাছে রেখে দেন, তখনও জেএসএস এর সুবিধাবাদী আপোষকামী নেতৃত্বগোষ্ঠি অর্থপূর্ণ ও কার্যকর কোন প্রতিবাদ করতে পারেননি। সরকারের যাতে বিরাগভাজন হতে না হয় সেজন্য তারা পত্রিকায় বিড় বিড় করে কিছু বলে এবং রাঙামাটিতে দায়সারাভাবে মৃদু ও সরকারের কাছে সহনশীল 'প্রতিবাদ মিছিল' করেছেন মাত্র। এতে তারা দু'টি উদ্দেশ্য হাসিল করতে চেয়েছেন। এক. জনগণের কাছে 'সংগ্রামী' 'প্রতিবাদী' সাজা। দুই. সরকারেরও বিরাগভাজন না হওয়া।

জেএসএস নেতৃত্বগোষ্ঠির এ ধরনের সুবিধাবাদী আচরণের ব্যাখ্যা হচ্ছে একটাই। আর তা হলো, তারা আঞ্চলিক পরিষদে - যেখানে আদতে কোন কাজকর্ম নেই, কেবল বসে বসে ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি ভোগ করা ছাড়া - ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছেন এবং তারা তা কোনভাবেই ছাড়তে রাজী নন। সেজন্য তারা এমন কোন কাজ বা আচরণ করতে চানা না, যা তাদের পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা সরকারকে চটাতে পারে। চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে ইউপিডিএফ সর্বাত্মক সহযোগিতার প্রস্তাব দেয়ার পরও জেএসএস নেতৃত্ব গোষ্ঠি তা প্রত্যাখ্যান করার কারণ হচ্ছে এটাই। কারণ চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের ওপর চাপ দিতে হলে তার জন্য দরকার আন্দোলন। কিন্তু তা তারা করবেন না, পাশে সরকার তাদের ওপর রুষ্ট হয়ে আঞ্চলিক পরিষদের গদি থেকে খেদিয়ে দেয়। জেএসএস নেতাদের এমনই গদি হারানোর ভয়।

অথচ, চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের ওপর

২য় পাতায় দেখুন

রামগড়ে স্থানীয় এক সন্ত্রাসী চক্রের বিরুদ্ধে জনতার প্রতিরোধ

খাগড়াছড়ি জেলাধীন রামগড় থানার এক দূরবর্তী গ্রাম তৈচাকমা। এটি একটি ত্রিপুরা গ্রাম। বাটনা ইউনিয়নে তার অবস্থান। এখানে শতাধিক পরিবারের বসবাস। বর্তমানে নিরীহ খেটে খাওয়া গ্রামবাসীদের কোন শান্তি নেই। বছর দেড়েক আগে গজে ওঠা একটা সন্ত্রাসী চক্রের অত্যাচারের ভয়ে তাদেরকে সবসময় ত্রটস্থ থাকতে হয়।

১৫-২০ জনের এই সন্ত্রাসী চক্রের মূল হোতা হচ্ছে স্থানীয় আওয়ামী লীগের সদস্য মণিন্দ্র ত্রিপুরা। তার বয়স চল্লিশের ওপরে। এলাকায় সে ত্রাস ও সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত। রামগড় থানায় তার বিরুদ্ধে দুইটি খুনের মামলা ঝুলে আছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এই মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এলাকায় তার ভূমিকা সব সময়ই গণস্বার্থ বিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল। বর্তমানে জনসংহতি সমিতির সাথে তার সখ্যতা থাকলেও এক সময় শান্তিবাহিনীর সদস্যরা তাকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে ধরে নিয়ে যায়। পরে গ্রামবাসীদের অনুরোধে জেএসএস তাকে ছেড়ে দেয়। এরপরও তার চরিত্র সংশোধন হয়নি। তার অত্যাচারে এলাকার সাধারণ জনগণের দুঃখ কষ্টের সীমা নেই। প্রত্যেক পরিবারকে তার সন্ত্রাসী চক্রকে চাঁদা দিতে হয়। তার নির্দেশে প্রত্যেককে তার দোকান থেকে সওদা কিনতে হয়। তার কুকর্মের বিরুদ্ধে কোন কথা বললে তাকে গ্রাম থেকে জোরপূর্বক বের করে দেয়া হয় ও তাদের সম্পত্তি বেদখল করা হয়। এভাবে বেশ কয়েকটি পরিবার গ্রামছাড়া হয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। বিগত ১লা অক্টোবর সংসদ নির্বাচনে তার কথামত ভোট না দেয়ার কারণে অনেককে মারধর করা হয়। ইউপিডিএফ সদস্য কিষাণের মাকে পর্যন্ত তারা গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করে। ফলে তার সন্ত্রাসী চক্রের অত্যাচারে গ্রামবাসী চরমভাবে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তার অত্যাচার ও জোর জুলুম থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য নিরীহ গ্রামবাসীরা ইউপিডিএফ এর শরণাপন্ন হয়। ইউপিডিএফ মণিন্দ্র ত্রিপুরার এই সন্ত্রাসী চক্রের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করতে থাকে এবং এক সময় জনগণ তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জনতা গণদুষমন মণিন্দ্র ত্রিপুরার বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। জনতার এই প্রতিরোধের সূত্রপাত হয় এভাবে। মণিন্দ্র ত্রিপুরার সন্ত্রাসীরা খগেশ্বরী ত্রিপুরা নামে তের চৌদ্দ বছরের এক কিশোরীকে জোরপূর্বক অপহরণ করে। মেয়েটির বাবা তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করলে পুলিশ দু'একবার তৈচাকমা গ্রামে যায়। পুলিশ অপহরণকারীদের গ্রেফতারের জন্য কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেয়নি। এলাকার লোকজনের অভিযোগ মণিন্দ্র চক্র পুলিশকে বিপুল পরিমাণ টাকা দিয়ে বশ করে রাখে। এ কারণে পুলিশও আর কোন তৎপরতা দেখায়নি। এখনো পর্যন্ত মেয়েটি উদ্ধার হয়নি।

এদিকে অপহরণ মামলা দায়ের করার কারণে মণিন্দ্র অপহৃত মেয়ের বাবাকে ধরে নিয়ে আসে। সে তাকে কুকুরের মত ব্যবহার করে। পরে ছাড়া পেলে খগেশ্বরী ত্রিপুরার বাবা পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে বিচার না পেয়ে ইউপিডিএফ-এর সাহায্য প্রার্থনা করে। ইউপিডিএফ মীমাংসার জন্য এলাকার মুরুব্বীদের নিয়ে সভা আহ্বান করে। সন্ত্রাসী মণিন্দ্র এলাকার জনগণকে ভয় ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আবার ৬ জনকে অপহরণ করে। ফলে সন্ত্রাসী মণিন্দ্র গ্রুপের সাথে এলাকার সাধারণ ব্যাপক জনগণের দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। রামগড়ের টিএনও এই দ্বন্দ্ব নিরসনের উদ্যোগ নিয়েও ব্যর্থ হন। ২৮ জুলাই ইউপিডিএফ ও জনতা মিলে সন্ত্রাসীদের ধরতে যায়। কিন্তু সন্ত্রাসীরা গুলি চালালে ২ জন আহত হয়। এরপর ৪ আগষ্ট ইউপিডিএফ এর নেতৃত্বে এলাকার জনগণ আবার রুখে দাঁড়ান। তারা সন্ত্রাসীদের গ্রাম থেকে বের করে দেয় ও ৭ জনকে আটক করে। পরে ইউপিডিএফ তাদের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়ে ছেড়ে দেয়। স্থানীয় এই অভ্যুত্থানের সময় জনতা সন্ত্রাসী মণিন্দ্র ত্রিপুরার বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। এভাবে এক সন্ত্রাসী চক্রের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ পরিণতি লাভ করে। বর্তমানে সন্ত্রাসী মণিন্দ্র পুরোপুরি জেএসএস-এর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছে ও চট্টগ্রামে অবস্থান করছে বলে জানা গেছে।

সম্পাদকীয়

স্বাধিকার ❑ ৫ সেপ্টেম্বর ২০০২ ❑ বুলেটিন নং ২১

ইউপিডিএফ-এর ওপর সরকারী নির্যাতন বন্ধ করা হোক

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের মতো বর্তমান বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের গণতান্ত্রিক দল ইউপিডিএফ-এর ওপর অব্যাহত দমন পীড়ন চলছে। গত মাসের শেষ দুই সপ্তাহে খাগড়াছড়িতে পুলিশ দুই বারে মোট ১৩ জন ইউপিডিএফ সদস্য ও সমর্থককে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারা প্রয়োগে আটক করেছে। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ ছিল না। মূলত সেনা বাহিনী কিংবা পুলিশ কর্তৃক পার্টির সদস্যদের গ্রেফতার ও নানাভাবে হয়রানি এখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যদের সন্ত্রাস তো আছেই। তাদের হাতে আজ পর্যন্ত ইউপিডিএফ এর প্রায় শ' খানেক প্রাণ হারিয়েছেন। আমরা আশা করি, সরকার অচিরেই ইউপিডিএফ-এর ওপর রাজনৈতিক নিপীড়ন বন্ধ করবেন। নির্বাচনে দেয়া প্রতিশ্রুতি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকৃত শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য সকল মহলের সাথে আলোচনা শুরু করবেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের রাজনীতি

॥ পর্যবেক্ষক ॥

সম্প্রতি UNDP-Government Joint Security Risk Assessment Mission নামে একটি টিম পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলা - বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি - সফর করেছেন। এই মিশনের উদ্দেশ্য হলো মূলত দুইটি: উন্নয়নের জন্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা ও কোন ধরনের প্রজেক্ট হাতে নেয়া যায় তা দেখা। মিশন ১লা জুন থেকে ৯ জুন পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে সফরে ব্যস্ত ছিলেন। এ সময় তারা ইউপিডিএফ, জেএসএস, সেনাবাহিনীর সদস্যসহ আরো অনেকের সাথে সাক্ষাত ও আলাপ আলোচনা করেছেন। সফর শেষে ফিরে এসে তারা ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে তাদের রিপোর্টও পেশ করেছেন, যার মূল কথা হলো পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন কাজ শুরু করা যেতে পারে।

সত্যি বলতে কি, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে বহু আগে থেকে উন্নয়নের ঘুম পাড়ানি গান শোনানো হচ্ছে। সেজন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন শব্দটি নতুন কিছু নয়। বহু আগে থেকেই এ অঞ্চলের জনগণ এ শব্দটির সাথে পরিচিত। শুধু পরিচিত নয়, উন্নয়ন সম্পর্কিত অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতাও তাদের রয়েছে। তাদের অভিজ্ঞতা বলে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে যত বেশী 'উন্নয়ন' কাজ হয়েছে, তত বেশী তারা নিঃস্ব হয়েছেন, নিজের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়েছেন ও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে প্রথমে কাপ্তাই বাঁধের কথা আলোচনা করা যেতে পারে। ১৯৬০ দশকে ইউএস-এইড এর আর্থিক সহায়তায় নির্মিত এই বাঁধ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জন্য কি বিপর্যয় নিয়ে এসেছে তার বিস্তারিত বর্ণনা না দিলেও চলবে। কাপ্তাই বাঁধ পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কি প্রভাব ফেলেছে সে সম্পর্কে ব্যাপক লেখালেখি হয়েছে। কাজেই পুনরুক্তি এড়াতে এখানে শুধু এটুকু বলা যথেষ্ট হবে যে, কাপ্তাই বাঁধ ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জন্য এক চরম অভিশাপ। অথচ, তখনো কি উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি? পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদেরকে কি শোনানো হয়নি সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির অমৃত ললিতবাণী?

তারপর বাংলাদেশ আমলে জিয়াউর রহমান কর্তৃক স্থাপিত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কথা আলোচনা করা যেতে পারে। ১৯৭৬ সালে এই বোর্ড গঠন করা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়ে থাকে যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এই বোর্ডের মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। গত আড়াই দশকে উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে রাবার প্লান্টেশন, হর্টিকালচার, জুমিয়া পুনর্বাসন, কমিউনিটি উন্নয়ন ইত্যাদি। কিন্তু উন্নয়নের সরকারী কল্পকাহিনী সত্বেও এই বোর্ড পার্বত্য চট্টগ্রামে জনগণের জীবন মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে দৃষ্টিগ্রাহ্য তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। এর প্রধান কারণ হচ্ছে প্রথমত উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ন্যায়সঙ্গত স্বাধিকার আন্দোলন দমনের জন্য তথাকথিত কাউন্টার ইন্সার্জেন্সির একটি কৌশল হিসেবে। দ্বিতীয়ত, সম্পূর্ণ সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী পরিকল্পনায় জনগণের মতামত ও আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন না থাকা। সামরিক বাহিনীর কর্তা ব্যক্তিরা এমন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন ও এমনভাবে তা বাস্তবায়ন করেছেন যাতে তাদের স্ট্রাটেজিক লক্ষ্য (সামরিক) বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ অবশ্যই উন্নয়ন চাই। এই উন্নয়ন কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়। এই উন্নয়ন সার্বিক - রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আন্তঃসাম্প্রদায়িক (inter-ethnic)। উন্নয়ন হচ্ছে একটি সামগ্রিক ধারণা। এর সাথে অধিকারের প্রশ্ন জড়িত। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা বা অধিকার থেকে বিযুক্ত করে দেখা হচ্ছে একটি অত্যন্ত ভুল ও একপেশে ধারণা। যে কোন জাতি ও জনগণের উন্নয়নের মূল শর্ত হচ্ছে তার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জন। এই অধিকার না থাকলে যে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হবে তার সিংহভাগ সুফল যাবে ডমিন্যান্ট জাতিগোষ্ঠির কাছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অভিজ্ঞতায় এর প্রমাণ মেলে। এযাবতকালে পরিচালিত উন্নয়নের ফলে মুখ্যত লাভবান হয়েছে সেনাবাহিনী ও বাঙালি ব্যবসায়ী-পুঁজিপতি শ্রেণী। যেমন, বিগত কয়েক বছরে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাস্তাঘাটের অভাবনীয় উন্নতির ফলে যাতায়ত ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে, যার সুফল সাধারণভাবে পাহাড়িরাও অন্যান্যদের মতো ভোগ করে থাকে। কিন্তু এর ফলে বিশেষভাবে লাভবান হয়েছে দু'টি গোষ্ঠি। এক হচ্ছে সামরিক বাহিনী, তথাকথিত কাউন্টার ইন্সার্জেন্সি অপারেশনের জন্য তাদের সৈন্য চলাচল সহজ হয়েছে। উন্নত রাস্তাঘাট ছাড়া 'বিদ্রোহ দমন' যে অসম্ভব ব্যাপার তা যে কোন সমর তত্ত্ববিদ নির্দ্বিধায় স্বীকার করবেন। অপরদিকে অন্য যে গোষ্ঠিটি লাভবান হয়েছে তা হলো ব্যবসায়ী পুঁজিপতি শ্রেণী, যারা একশ' ভাগ ডমিন্যান্ট বাঙালী জাতিগোষ্ঠির প্রতিনিধি। উন্নত ও আধুনিক রাস্তাঘাটের ফলে যে পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার একশ' ভাগ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তাদের হাতে। এটা সম্ভব হয়েছে, কারণ, তাদের হাতে পুঁজি থাকায় তারা সমস্ত পরিবহনের মালিক হয়ে উন্নত রাস্তাঘাটের সুফল নিজেদের ঘরে তুলতে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া, যাতায়াত সুবিধার কারণে একদিকে যেমন একেবারে প্রান্তস্থ ও দূরবর্তী এলাকা থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে, অপরদিকে সেই সব এলাকায় পর্যন্ত ঘরে ঘরে দেশীয় ও বহুজাতিক কোম্পানির পণ্য পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়েছে। এই কাজটির ওপর যাদের একচেটিয়া দখল ও নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তারা হলেন একইভাবে উপরে উল্লেখিত ব্যবসায়ি গোষ্ঠিটি। ভাবতে অবাক লাগে, পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম অঞ্চলগুলো পর্যন্ত এখন কোকা কোলা ও আরসি কোলা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এক কথায় যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন ও শোষণের দ্বার সম্পূর্ণভাবে খুলে গেছে।

কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রামের যে তথাকথিত আধুনিকায়ন তার দূরবর্তী ফলাফল যাই হোক না কেন, বর্তমান অবস্থায় তা থেকে সাধারণ পাহাড়ি ও বাঙালি জনগণের বিশেষ লাভবান হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। অপরদিকে, আমরা যদি বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠিগুলোর উন্নয়নের বলি হওয়ার অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করি, তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে উন্নয়নের কথা জোরে শোরে শোনা যাচ্ছে তাতে উৎফুল্ল হওয়ার বদলে বরং আতংকিতই হতে হবে।

দুই পার্টির মধ্যে ঐক্য ও সমঝোতার বিরোধীতা কার স্বার্থে?

১ম পাতার পর

ঐক্যবদ্ধ চাপ প্রয়োগের যে প্রস্তাব ইউপিডিএফ দিয়েছিল তাতে জেএসএস নেতৃবৃন্দের খুশী হওয়ারই কথা। কারণ চুক্তি বাস্তবায়ন হচ্ছে জেএসএস-এরই সর্বোচ্চ রাজনৈতিক কর্মসূচী, ইউপিডিএফ-এর নয়। ইউপিডিএফ বৃহত্তর স্বার্থে ও হানাহানি যাতে বন্ধ হয়, তার জন্য এই প্রস্তাব দিয়েছে। এর মধ্যে মতলব খুঁজতে গিয়ে জেএসএস নেতৃবৃন্দ যেভাবে নিজেদের সুবিধাবাদীতাকে আড়াল করতে চেয়েছেন তা অত্যন্ত দুঃখজনক। চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা ও আন্দোলন না করে, ক্ষমতায় থাকাকালে ইউপিডিএফ-কে নির্মূল করাই হলো এখন স্বৈরাচারী জেএসএস নেতৃত্বের আসল কর্মসূচী। তারা তাদের এই কর্মসূচী গোপন রাখেননি। ২০০০ সালের ১৩ নভেম্বর যুগান্তরের কাছে সন্তু লারমা এক সাক্ষাতকার দেন। রাজনৈতিকভাবে ইউপিডিএফ-কে মোকাবিলা করবেন কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি যুগান্তরকে বলেন,

> "পলিটিক্যালি নয়। এদের গলা টিপে হত্যা করতে হবে। যাতে কিছু না করতে পারে। হাত ভেঙে দিতে হবে, যাতে লিখতে না পারে। ঠ্যাং ভেঙে দিতে হবে, যাতে হাঁটতে না পারে। চোখ অন্ধ করে দিতে হবে, যাতে দেখতে না পারে। যারা চুক্তির পক্ষে জনগণের অধিকারের পক্ষে তারাই এ কাজ করবে।"

চুক্তি সম্পাদনের পর থেকেই সন্তু লারমার লোকজন ঠিক এ কাজটি নিরলসভাবে করে যাচ্ছে। সেজন্য আজ পর্যন্ত তাদের হাতে প্রায় শ'খানেক ইউপিডিএফ-এর কর্মি ও সমর্থক নিহত হয়েছেন।

নির্বাচন বয়কট ও প্রতিহত করার নামে তিনি যা করেছেন তাও হচ্ছে আসলে ইউপিডিএফ-কে প্রতিহত করা। ইউপিডিএফ যাতে প্রচারণা চালাতে না পারে সেজন্য সশস্ত্রভাবে বিভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাস চালিয়েছেন। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি রূপক চাকমাসহ পাঁচজনকে খুন করেছেন। লোকজনকে ভোট না দেয়ার জন্য হুমকি ভয় ভীতি প্রদর্শন করেছেন ও ভোটের দিন বাধা দিয়েছেন। অন্য কোন প্রার্থীকে তারা এভাবে বাধা দেননি। এমনকি যে সেটলারদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে তারা তাদের 'মহান' বয়কট ও প্রতিহত করণ কৌশল গ্রহণ করেছিলেন, সেই সেটলারদেরকেও তারা ভোট প্রদানে বাধা দেননি। শুধু তাই নয়, সুবিধাবাদী জেএসএস নেতৃত্বগোষ্ঠি প্রথমে গোপনে ও পরে প্রকাশ্যে বিএনপি-জামাত-ইসলামী ঐক্য জোট প্রার্থী মনিস্বপন দেওয়ানকে সমর্থন দেয় এবং বিভিন্ন এলাকায় লোকজনকে জোর করে ভোট কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে তার পক্ষে ভোট দিতে চাপ দেয়। নির্বাচনের পর জেএসএস নেতৃবৃন্দ তা স্বীকার করেছেন এবং এজন্য তারা কোন রকম লজ্জিত হননি, বরং এজন্য তারা গর্ব করছেন যে তাদের সমর্থিত প্রার্থীটি জিতেছে। জেএসএস না হলে বিএনপি-জামাত-ইসলামী ঐক্যজোট প্রার্থী মনিস্বপন দেওয়ান জিততে পারতেন না। তাদের ভাবখানা যেন এমন, যেহেতু 'আমাদের সমর্থনের কারণে সে জিতেছে, তাই এবার এর বিনিময়ে আমাদেরকেও কিছু দিতে হবে'। নোংরামি আর রাজনৈতিক জোচ্চুরি আর কাকে বলে! জেএসএস নেতৃত্বগোষ্ঠি একেই বলে 'কৌশল'! যাকে সবাই বলেন ডাবল স্ট্যান্ডার্ড বা দ্বিমুখী নীতি তাকেই তারা বলেন কৌশল! যাকে সবাই বলেন জ্বলন্ত মিথ্যাচার তাকেই তারা বলেন কূটনীতি! জেএসএস নেতৃত্ব গোষ্ঠির এমনই স্ট্যান্ডার্ড!!

জেএসএস নেতৃত্ব গোষ্ঠির সুবিধাবাদীতা, দালালীপনা ও প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতি সত্বেও, ইউপিডিএফ জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্য ও সমঝোতার প্রশ্নে আন্তরিক। অপরদিকে, জেএসএস নেতৃত্ব গোষ্ঠি বরাবরই ইউপিডিএফ-এর ঐক্য ও সমঝোতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে চলেছে। এই প্রত্যাখ্যানের জন্য কোন রকম ব্যাখ্যা তারা লিখিতভাবে দেয়নি। এভাবে ব্যাখ্যা দেয়া যে জনগণের কাছে তাদের একটি রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার অংশ তা তারা হয় বোঝেন না নয়ত স্বীকার করেন না। অবশ্য তারা বিভিন্ন জায়গায় লোকজনের কাছে মৌখিকভাবে নানা রকম ব্যাখ্যা হাজির করেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, জেএসএস অতীতে বাদি গ্রুপের সাথে সমঝোতা করে এক লারমাকে হারিয়েছে; আবার সমঝোতা করে তারা আর নেতা হারাতে চায় না। কী অখন্ডনীয় যুক্তি দেখুন! তাহলে কি তারা মনে করেন সমঝোতা হলেই তাদের নেতাকে হারাতে হবে, আর যে দ্বন্দ্ব সংঘাত চলছে তা জিইয়ে থাকলে তার কিছুই হবে না? দ্বিতীয়ত, তারা লাম্বা-বাদি গৃহযুদ্ধকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করছেন। লারমার মৃত্যুর কারণ যে জেএসএস-এর মধ্যে গণতান্ত্রিকভাবে রাজনৈতিক মতপার্থক্য নিষ্পতি না হওয়া ও তার ফলে সৃষ্ট সশস্ত্র গৃহযুদ্ধের ফল তা এমন এক মীমাংসিত সত্য যে সে ব্যাপারে আর প্রশ্ন তোলার কোন অবকাশ নেই। সেজন্য সমঝোতার কারণে লারমার মৃত্যু হয়েছে বলে মতলবী প্রচারণা চালিয়ে জেএসএস-এর নেতৃত্ব গোষ্ঠি জনগণের কাছ থেকে তার আসল উদ্দেশ্যকে আড়াল করতে পারবে না। সত্যকে স্বীকার করতে জেএসএস নেতাদের কেন এত ভয়?

আন্দোলন সংগ্রামে বিভিন্ন প্রশ্নে ও ইস্যুতে আন্দোলনকারী শক্তিগুলোর মধ্যে মত পার্থক্য থাকা অস্বাভাবিক কোন ব্যাপার নয়। এই মতপার্থক্য সত্বেও যে জাতি বা জনগণ ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছেন তারাই জয়লাভ করেছেন। যারা নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে মগ্ন থেকেছেন, মূল শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেননি, তারা জয়লাভ করতে পারেননি। এ বাস্তব সত্য যে সন্তু লারমারা বোঝেন না, তা কি বিশ্বাস করতে হবে? তারা কি দেখেন না, প্যালেস্টাইনীরা কিভাবে লড়াই চালাচ্ছে? পিএলও (প্যালেস্টাইন লিবারেশন অরগানাইজেশন) কোন মনোলিথিক সংগঠন নয়, এখানে রয়েছে বহু দল, যার মধ্যে আরাফাতের ফাতাহ্ -ও রয়েছে। পিএলও'র বাইরেও আরো অনেক দল গোষ্ঠি রয়েছে, যারা ইসরায়েলী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছে। পৃথিবীর সকল জায়গায় এভাবে মূল শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম চালানো হয়।

সুতরাং জনগণের মনে যে বিরাট প্রশ্ন তা হচ্ছে, কার স্বার্থে কাকে লাভবান করার জন্য জেএসএস -এর নেতৃত্ব গোষ্ঠি ঐক্য ও সমঝোতার বিরোধীতা করছে? জনগণের মধ্যেকার ঐক্য ও ভবিষ্যত কি এক ব্যক্তির কাছে, বা আরো সহজভাবে বললে, সন্তু লারমার ব্যক্তিগত খেয়াল খুশী ও ইচ্ছা অনিচ্ছার কাছে চিরদিন জিম্মি হয়ে থাকবে? তার ক্ষমতা ও গদি টিকিয়ে রাখার জন্য কি সাধারণ জনগণকে বলি হতে হবে? তার ব্যক্তিগত অহং বা ইগো জায়েজ করার জন্য কি সম্ভাবনাময় প্রতিশ্রুতিশীল অসংখ্য কর্মিকে প্রাণ দিতে হবে?

সুতরাং জনগণের মনে যে বিরাট প্রশ্ন তা হচ্ছে, কার স্বার্থে কাকে লাভবান করার জন্য জেএসএস -এর নেতৃত্ব গোষ্ঠি ঐক্য ও সমঝোতার বিরোধীতা করছে? জনগণের মধ্যেকার ঐক্য ও ভবিষ্যত কি এক ব্যক্তির কাছে, বা আরো সহজভাবে বললে, সন্তু লারমার ব্যক্তিগত খেয়াল খুশী ও ইচ্ছা অনিচ্ছার কাছে চিরদিন জিম্মি হয়ে থাকবে? তার ক্ষমতা ও গদি টিকিয়ে রাখার জন্য কি সাধারণ জনগণকে বলি হতে হবে? তার ব্যক্তিগত অহং বা ইগো জায়েজ করার জন্য কি সম্ভাবনাময় প্রতিশ্রুতিশীল অসংখ্য কর্মিকে প্রাণ দিতে হবে? আজ পর্যন্ত আত্মঘাতি সংঘাতে যারা প্রাণ হারিয়েছেন (তারা যে দলেরই হোন না কেন) তাদের কাউকে এভাবে মরতে হতো না, যদি ইউপিডিএফ ও জেএসএস-এর মধ্যে ঐক্য ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হতো। যদি সন্তু লারমা প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে ইউপিডিএফ-এর সাথে আলোচনায় ও ঐক্য স্থাপনে রাজী হতেন।

সেজন্য বর্তমানে যে সংঘাত চলছে ও তার ফলশ্রুতিতে সাধারণ জনগণের মধ্যে যে চরম ভোগান্তি তার জন্য তাকেই দায়ি হতে হবে। যারা এ যাবত প্রাণ হারিয়েছেন, এ সংঘাতে, তাদের লাশের বোঝা তাকেই বহন করতে হবে। যে আত্মঘাতি সংঘাত চলছে তার জন্য যে ব্যক্তি দায়ি তিনি হলেন সন্তু লারমা। ইতিহাস কি তাকে কখনো ক্ষমা করবে? এখনো সবার প্রত্যাশা, জেএসএস নেতৃত্বের শুভবুদ্ধির উদয় হোক।

এলাকা সংবাদ

ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দের সাথে ইউএনডিপি-বাংলাদেশ সরকারের যৌথ টিমের সাক্ষাত

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ ১লা জুন থেকে নয় দিন ব্যাপি পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরের সময় ইউএনডিপি-বাংলাদেশ সরকারের যৌথ নিরাপত্তা ঝুঁকি মূল্যায়ন মিশনের নেতৃবৃন্দ খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাত করেছেন। গত ৪ জুন খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে এই মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। ইউপিডিএফ জেলা শাখার পক্ষে নেতৃত্ব দেন অনিমেষ চাকমা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মিল্টন চাকমা ও জেলাস চাকমা। অপরদিকে, ইউএনডিপি-সরকারের যৌথ প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব দেন মিশন প্রধান মাইকেল হেন।

ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ মিশন প্রতিনিধিদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন। তারা বলেন, উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো শান্তি ও স্থিতিশীলতা যা চুক্তির পরও এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামে ফিরে আসেনি। কারণ জেএসএস ও সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চুক্তিতে জনগণের মূল দাবিগুলোর কোনটিই পূরণ করা হয়নি।

বর্মাছড়িতে ঘরে ঘরে সেনা তল্লাশী, নিরীহ লোকজন হয়রানির শিকার

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ গত ১৮ এপ্রিল ২০০২ সকাল ১১টার সময় লক্ষ্মিছড়ির শুকনাছড়ি ক্যাম্প কমান্ডার জিল্লুর রহমানের নেতৃত্বে একটি সেনাদল (১ ই: বেঙ্গল, আর্টিলারী) বর্মাছড়ির উপর পাড়া (কান্দপ) গ্রামে ঘরে ঘরে তল্লাশি চালায়। সেনারা বাড়ির জিনিসপত্র তছনছ করে দেয় এবং চলে যাওয়ার সময় হরি মোহন চাকমার বাড়ি থেকে একটি ভিডিও ক্যাসেট নিয়ে যায়।

যাদের বাড়ি ঘরে তল্লাশি চালানো হয় তাদের নাম হলো কমল কৃষ্ণ চাকমা ৪৫ পিতা মৃত পেগেন্দ্র চাকমা, লালেন্দ্র চাকমা ৩০ পিতা মিস্টান্ন চাকমা, নীল বর্ণ চাকমা ৪০ পিতা মৃত সেকেন্দ্র চাকমা, বাগান কুমার চাকমা ২৫ পিতা অজ্ঞাত ও হরি মোহন চাকমা ২৮ পিতা সেকেন্দ্র চাকমা। হরিমোহন চাকমা পিসিপি বর্মাছড়ি শাখার প্রাক্তন সভাপতি।

একই দিন ঐ পাঁচজনের বাড়িতে তল্লাশি চালানোর পর সেনারা হাজাছড়ি গ্রামে উঁচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত কালা মাস্টার নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে হানা দেয়। সেখানে গিয়ে জিল্লুর রহমান কালা মাস্টারের কাছে জিজ্ঞেস করে তার বাড়িতে কারোর অসুখ করেছে কিনা। উত্তরে কালা মাস্টার বলেন যে, তার বাড়িতে অসুস্থ লোক আছে। এরপর জিল্লুর রহমান নিজেকে সিপাহী পরিচয় দিয়ে বলে " আমার সাথে একজন লোক দাও, স্যারের কাছ থেকে ঔষুধ দিয়ে দেব।" কালা মাস্টার নিজে তার সাথে যেতে চাইলে জিল্লুর রহমান তার (কালা মাস্টার) ৮ বছরের শিশুকণ্যা পুষ্পরাণী চাকমাকে পাঠাতে বলে। কালা মাষ্টার অগত্যা রাজি হলে পুষ্পরাণীকে সঙ্গে নিয়ে জিল্লুর রহমান "তার স্যারের" কাছে যাওয়ার জন্য রওনা দেয়। কিন্তু "কি ছিল বিধাতার মনে" তা কালা মাস্টার জানতে পারেনি। কিছুদূর এসে জিল্লুর রহমান পুষ্পরাণীর হাত মুখ চেপে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। তার চিৎকারে কালা মাষ্টার দ্রুত ছুটে যায়। ফলে নরপশু জিল্লুর রহমানের ধর্ষণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

সেনা কমান্ডারের অশোভন আচরণের প্রতিবাদ করলে মারধর

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ গত ৪ মে ২০০২ সকাল দশটার দিকে লক্ষ্মীছড়ি সেনা জোনের অধীন শুকনাছড়ি সাব জোন কমান্ডার জিল্লুর রহমান (১ বেঙ্গল, আর্টিলারী) বর্মাছড়ি মধ্যম গ্রামের বাসিন্দা চিত্ত কুমার চাকমার বাড়িতে একা গিয়ে হানা দেয়। তখন চিত্ত কুমার ও তার স্ত্রী জুম ক্ষেতে কাজ করতে গিয়েছিলেন। বাড়িতে ছিল তার ১২ বছরের ছেলে ইন্দ্র চাকমা ও ছোট ভাইয়ের কিশোরী কণ্যা কল্পনা চাকমা (১৪)। জিল্লুর বাড়ির মালিক আছে কিনা জিজ্ঞেস করলে ছেলেটি নাই বলে উত্তর দেয়। এর পর জিল্লুর বাড়ির ভিতরে গিয়ে কল্পনার পাশে বসে তার সাথে অশোভন আচরণ করতে থাকে। ইন্দ্র চাকমা এর প্রতিবাদ করলে সে তার গালে চড় বসিয়ে দেয় ও পরে লাঠি নিয়ে মারতে উদ্যত হয়। পরে ইন্দ্র কল্পনা চাকমাকে নিয়ে দৌঁড়ে তাদের পাশের শান্তি চাকমার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। কমান্ডার জিল্লুর তাদের পিছু নেয়। কিন্তু ঐ বাড়িতে আরো লোকজন দেখতে পেয়ে মাথা নিচু করে চোরের মতো ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে চলে যায়। এর আগে গত ৩ মে উক্ত কমান্ডার তার দল বল নিয়ে ঐ গ্রামে হানা দিয়েছিল। তখন সে পাড়ার বখাটে ছেলের মতো অনিলা দেবী চাকমা ১৮ পিতা মদন মোহন চাকমা নামে গ্রামের এক যুবতি মেয়ের সাথে অশ্লিল-অশোভন ভাষায় কথা বলে ও উত্যক্ত করে। জিল্লুর রহমানের এ ধরনের আপত্তিকর আচরণে এলাকাবাসী অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ। গ্রামের অভিভাবকরা এখন তাদের মেয়েদেরকে বাড়িতে একা রেখে বাইরে কাজে যেতে ভয় পান। তারা জানেন না কার কাছে নালিশ করলে এ ধরনের সেনা হয়রানির প্রতিকার পাওয়া যাবে বা আদৌ পাওয়া যাবে কিনা।

জেএসএস-এর সশস্ত্র সদস্য কর্তৃক নিরীহ লোকজনকে মারধর

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ ৯ জুন ২০০২ প্রজ্ঞান খীসা ও সাবেক শান্তিবাহিনীর সদস্য অলক এর নেতৃত্বে ২৬ জনের জেএসএস এর একটি সশস্ত্র দল রাঙ্গামাটি জেলার নান্যাচর থানার হরিনাথ ছড়া এলাকা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। এ সময় তারা ঐ গ্রামের অমর জ্যোতি চাকমা (১৮) ও রতন জ্যোতি চাকমা (২০) পিতা শশী কুমার চাকমা নামে দু' ব্যক্তিকে কোন কারণ ছাড়াই মারধর করে। সন্ত্রাসীরা রতন জ্যোতি চাকমাকে এমনভাবে মারধর করে যাতে কেবল অন্তর্বাস ছাড়া পরণের সব কাপড় খুলে যায়। সন্ত্রাসীরা তাকে মুমুর্ষু অবস্থায় বাড়ির উঠোনে ফেলে রেখে চলে যায়।

পরদিন অর্থাৎ ১০ জুন জেএসএস এর এই সশস্ত্র দলটি নান্যাচরের দচলা এলাকায় অবস্থান নেয়। সকাল ৬টার দিকে তারা আরও দুই গ্রামবাসীকে বেদম মারধর করে। এরা হলেন ডানে সাবেক্ষ্যং গ্রামের অমৃত লাল চাকমা (৩২) ও ধনঞ্জয় চাকমা (২৮) পিতা মুরতি মোহন চাকমা। ঘটনার সময় তারা সকালে ঘুম থেকে ওঠে কাজে যাচ্ছিলেন।

এরপর সশস্ত্র দলটি নোয়াদামে হরিশ্চন্দ্র চাকমা (২৯) পিতা মৃত চুমো চাকমার বাড়িতে অবস্থান নেয়। তাদেরকে দেখে হরিশ্চন্দ্র চাকমার পোষা কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। সন্ত্রাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে বাড়ির মালিক হরিশ্চন্দ্র চাকমাকে কঠোর ভাষায় নির্দেশ দেয়: "এই বজ্জাত কুকুরটিকে যেন ২/১ দিনের মধ্যে মেরে ফেলতে হবে। নইলে আবার এসে যদি কুকুরটা দেখা যায় তাহলে তোমাকে (হরিশ্চন্দ্র চাকমাকে) খুন করা হবে।" অগত্যা হরিশ্চন্দ্র চাকমা নিজের গাটের ৫০ টাকা খরচ করে অন্য একজনকে দিয়ে তার পোষা প্রিয় কুকুরটিকে মেরে ফেলতে বাধ্য হয়।

জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্য কর্তৃক ইউপিডিএফ কর্মির বাড়ি লুট

প্রজ্ঞান খীসা ও অলক এর নেতৃত্বে জেএসএস-এর সশস্ত্র দলটি এরপর ১২ জুন লংগদুর মধ্য হাড়িকাবায় ইউপিডিএফ-এর একনিষ্ঠ কর্মি বিমল চাকমার বাড়িতে হানা দেয়। বাড়িতে কাউকে না পেয়ে সন্ত্রাসীরা আনুমানিক ৫০৫০০ টাকা মূল্যমানের বাড়ির মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়। এরমধ্যে ঢেউটিন ২ বান্ডিল, শুকনা হলুদ ২৫ মন, ছাগল ৬টি ও গৃহস্থালী সামগ্রী। এছাড়া সন্ত্রাসীরা বাড়ির পাশের কলাবাগানের সব কলা গাছ কেটে দেয়।

একইভাবে ইউপিডিএফ কর্মি অম্লান চাকমা ও বিনয় চাকমার বাড়িতেও লুটপাট করা হয়। সাবেক জেএসএস সদস্য রাহুল এই লুটপাটে নেতৃত্ব দেয়।

তিবিরা ছড়ায় জনগণের ওপর অত্যাচার ও হুমকি

১০ জুলাই জেএসএস এর সশস্ত্র দলটি বন্দুকভাঙার তিবিরা ছড়ায় হানা দেয়। তারা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। তারা গ্রামের রেঙ' চাগ ক্লাব ও বৃগ মনির দোকান পুড়িয়ে দেয়। তিরিরাছড়া বাসীদেরকে তারা প্রতিদিন মাংস সহযোগে খাবার ব্যবস্থা করে দেয়ার নির্দেশ জারি করে। কর্তব্যরত তংগলি মাকে উদ্দেশ্য করে গুলি চালায়। সে কোন রকমে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করে। অনেককে বেদম মারধর করে।

গামাঢ়ীঢালায় জেএসএস কর্তৃক ৩ ব্যক্তি অপহৃত, মুক্তিপণ আদায়

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ প্রজ্ঞান সীসার নেতৃত্বে জেএসএস-এর একটি সশস্ত্র দল গত ১৪ জুলাই রাত ১১টায় খাগড়াছড়ি জেলার গামাঢ়ীঢালা গ্রামের ৩ ব্যক্তিকে অপহরণ করে। সন্ত্রাসীরা তাদের কাছ থেকে আড়াই লাখ টাকা মুক্তিপণ আদায় করে। অপহৃতরা হলেন প্রবোধ কুমার চাকমা (৩০) পিতা যুপেন্দ্র লাল চাকমা সহকারী শিক্ষক, মাইচছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়, সুনীল জীবন তালুকদার (৩৫) ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, গোলাবাড়ি ইউনিয়ন, ও তাপস চাকমা (পিন্টু) (২৬) পিতা মনিন্দ্র শেখর চাকমা। ইউপিডিএফ সদস্যরা তাদের বাড়িতে অবস্থান করে এই মিথ্যা অভিযোগে তাদেরকে অপহরণ করা হয়। বিপুল পরিমাণ মুক্তিপণের টাকা আদয়ের পর অপহরণকারীরা সপ্তাহ খানেক পর তাদেরকে ছেড়ে দেয়। মুক্তিপণের টাকা জোগার করতে তাদেরকে জমিসহ অন্যান্য সহায় সম্পত্তি বিক্রি করতে হয়। প্রবোধ কুমার চাকমা ও সুনীল জীবন তালুকদারের মুক্তির জন্য মোট ২ লাখ টাকা ও তাপস চাকমার জন্য ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দিতে বাধ্য করা হয়।

কাউখালিতে সেনা - পুলিশের যৌথ তল্লাশি

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ গত ৫ আগষ্ট ২০০২ সেনাবাহিনী ও পুলিশের ১৯ সদস্যের একটি যৌথ দল কাউখালি থানাধীন ঘাগড়া ইউনিয়নের পানছড়ি, উল্ল ও তালুকদার পাড়ায় ব্যাপক তল্লাশী অভিযান পরিচালনা করে।

উক্ত অভিযানের সময় সেনা ও পুলিশ সদস্যরা পানছড়ির মঙ্গল শান্তি চাকমা, প্রশ্ন কুমার চাকমা, পলাশ চাকমা, বুদ্ধমণি চাকমা ও গধারামের বাড়ি এবং তালুকদার পাড়ার ধন বিকাশ চাকমার দোকান তল্লাশী ও ভাঙচুর করে। তারা উল্ল রাঙি পাড়ার বিমল মহাজনের বাড়িতে জোর করে দুপুরের খাবার খায়।

একই তারিখে নান্যাচর থানাধীন বুড়িঘাট ইউনিয়নের কৃষ্ণমাছড়া, রামহরি পাড়া, মাইচছড়ি, হেডমারা, হেরেটছড়ি গ্রামেও ব্যাপক সেনা তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। সেনা অভিযানকালে উল্ল পাড়া বৌদ্ধবিহারে সেনা সদস্যরা জুতা পায়ে ঢুকে পড়ে এবং বিহারের জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। এ তল্লাশি অভিযানে নেতৃত্ব দেয় কাউখালি সাব-জোন কমান্ডার মেজর নাহিদুল ইসলাম খান ও সুবেদার বেলায়েত। পাহাড়িদের গ্রামে গ্রামে কারণে অকারণে সেনাবাহিনীর এ ধরনের তথাকথিত তল্লাশি অভিযানের ফলে জনমনে ভীতি ও আতংক বিরাজ করছে।

পাহাড়ি যুব ফোরাম গঠিত

শেষ পাতার পর

ব্যবসায় বাণিজ্যে সম্পৃক্ত হতে পারছে না। অথচ সম্ভাবনাময় এই তরুণ যুব সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারলে এরা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

সেজন্য সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হাজার হাজার তরুণ যুবকদের আশা আকাঙ্খা ও দাবি দাওয়া বিশ্বস্ততার সাথে তুলে ধরার জন্য দরকার একটি সংগঠনের। হতাশার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে নেশার কবলে পড়ে সম্ভাবনাময় জীবনশক্তিকে আর নিঃশেষিত করা নয়, কিংবা কর্মহীন হয়ে বসে থেকে বৃথা সময় নষ্ট করা নয়, এখন সময় এসেছে নিজেদের ন্যায্য অধিকার ছিনিয়ে আনার আয়োজনে সামিল হওয়া।

খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ-এর ১৩ জন কর্মি ও সমর্থক গ্রেফতার

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ সম্প্রতি খাগড়াছড়িতে পুলিশ ১৩ জন ইউপিডিএফ কর্মি ও সমর্থককে গ্রেফতার করেছে। গত ২০ আগষ্ট পুলিশ খাগড়াছড়ি শহরের নারাঙহিয়া থেকে ইউপিডিএফ-এর ৩ জন সদস্য ও পেরাছড়া থেকে ৩ জন সমর্থককে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে। এরা হলেন, এমনি ত্রিপুরা, (২০) পিতা নীলা ত্রিপুরা গ্রাম পল্টনজয় পাড়া, খাগড়াছড়ি, আকর্ষণ চাকমা (২৭) পিতা মৃত শান্তি দুলাল চাকমা, গ্রাম গাদতু পাড়া, গামাঢ়ীঢালা, তরুণ কান্তি চাকমা (২৩) পিতা মৃত মঙ্গল মোহন চাকমা গ্রাম বাঘাইছড়ি মুখ, জ্ঞান রতন চাকমা (নাটোং) (২০) পিতা মতিলাল চাকমা গ্রাম ১নং প্রকল্প, সুনীল চাকমা (১৭) পিতা দুর্বাশা চাকমা গ্রাম ছোটনালা ও তপন চাকমা (২০) পিতা চন্দ্র বংশ চাকমা গ্রাম গোরগোজ্যা ছড়ি।

এরপর গত ৩০ তারিখ পুলিশ আরো ৮ জনকে আটক করে। তাদেরকে সম্প্রতি হরিনাথ পাড়ায় সংঘটিত কথিত অপহরণ ঘটনার সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে আটক করা হয়েছে বলে চট্টগ্রামের দৈনিক পূর্বকোণ জানিয়েছে। আটককৃতরা হলেন, ১নং খাগড়াছড়ি ইউনিয়নের গ্রাম পশ্চিম গামাঢ়ীঢালা গ্রামের ইউপিডিএফ সদস্য উত্তম দেওয়ানের বাবা দ্বীন মোহন চাকমা (৫২) ও মা কুসুম কুমারী দেওয়ান (৫০), সুকীর্তি চাকমা (২৪) পিতা করুণাময় চাকমা, খবংপুজ্যা গ্রামের অনুত্তর চাকমা (২৮) পিতা পুরুষোত্তম চাকমা, দীপায়ন চাকমা (২৫) পিতা বিনয় ভূষণ চাকমা, বিপ্লব চাকমা (২৮) পিতা চন্দ্রজ্যোতি চাকমা, মহাজন পাড়ার জুয়েল চাকমা (২১) পিতা সুকীর্তি চাকমা ও হরিনাথ পাড়া গ্রামের সুনীল দেবী চাকমা (৪৮) স্বামী মতিলাল চাকমা। সুনীল দেবী চাকমা গোলাবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যা।

পেরাছড়া থেকে জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্য কর্তৃক ২ ব্যক্তি অপহৃত

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ গত ৩১ আগষ্ট খাগড়াছড়ির গিরিফুল এলাকা থেকে জেএসএস-এর কতিপয় সশস্ত্র সদস্য ২ নিরীহ ব্যক্তিকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এরা হলেন নরেশ চাকমা (৩০) ও অমরেন্দ্র চাকমা (২৫) পিতা আদিত্য বরণ চাকমা। রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়নি।

ঢাকায় ১২ জুন কল্পনা অপহরণ দিবস পালিত

১২ জুন ঢাকায় হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের যৌথ উদ্যোগে কল্পনা অপহরণের অর্ধযুগ পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে অবিলম্বে তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ ও লেঃ ফেরদৌস এর বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও মানব বন্ধন কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। সংহতি প্রকাশ করেন বদরুদ্দীন উমর, শামসুন্নাহার জ্যোৎস্না, আবেদা গুলরুখ ও অরূপ রাহী। এছাড়া বক্তব্য রাখেন সমারী চাকমা, ইলিরা দেওয়ান, মিঠুন চাকমা ও দীপংকর ত্রিপুরা।

আন্তর্জাতিক

জাপানে বৈসাবি উৎসব পালিত

টোকিও, জাপান ॥ জাপানে বসবাসরত জুম্মরা ১৪ এপ্রিল টোকিওতে বৈসাবি উৎসব পালন করেছেন। এ উপলক্ষে জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক-জাপান শাপলানীর নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহযোগিতায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এর মধ্যে রয়েছে আমন্ত্রিত জাপানী অতিথিদের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী জুম্ম খাদ্য পরিবেশন, স্থির ও ভিডিও চিত্র প্রদর্শন, ঐতিহ্যবাহী জুম্ম পোশাক শো ও খেলাধুলা ইত্যাদি।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শাপলানীরের সাধারণ সম্পাদক শিমোজাওয়া টাকাশি। শতাধিক লোকজন, যাদের আটজন ছাড়া বাকি সবাই জাপানী, এই বৈসাবি উৎসবে সামিল হন। জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক-জাপানের অনুরোধে লোগাং গণহত্যায় শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। চিচিক্কো চাকমা লোগাং গণহত্যার ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেন।

জুম্মদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও খাদ্য আমন্ত্রিত জাপানী অতিথিদের মধ্যে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়। তাদের মধ্যে অনেকেই প্রথমবারের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত জুম্মদের সম্পর্কে অবহিত হন। সেকা চাকমা ও মাটসুদা মিদোরি রান্নায় নেতৃত্ব দেন। প্রায় ১৫ জন জাপানী স্বেচ্ছাসেবী তাদেরকে সাহায্য করেন। 'পাজন'কে প্রধান করে ছয় প্রকার রান্না পরিবেশন করা হয়। রান্নার অন্যান্য আইটেমগুলো হলো শুকনা মাছ দিয়ে বেগুন তরকারি, চিংড়ি ও শুকর মাংস দিয়ে কাবোচা, মুরগীর ঝাল, সালাদ ও বরাপিদা (চাকমাদের এক প্রকার পিঠা)।

অপরদিকে, চিচিক্কো চাকমা, আজুমো হিরোনো, সোনারাম চাকমা ও কেনজি কুনো স্থির ও ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করেন।

শাপলানীরের স্বেচ্ছাসেবী সদস্য সেটোগুচি ও ফুজিওয়ারা খুব সুন্দরভাবে সেজে গুজে জুম্ম ড্রেস পরে উপস্থিত অতিথিদের সম্মুখে হাজির হন। তারা কিভাবে এই পোষাক পরিধান করতে হয় তাও শিখিয়ে দেন।

সেকা চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামে ঐতিহ্যবাহী খেলা সম্পর্কে অতিথিদের পরিচিত করান। এর মধ্যে রয়েছে ঘিলা হারা, নাদেং হারা ইত্যাদি।

জেপিএনজে তাদের প্রকাশনা "অধিকার" এর বিশেষ সংখ্যাও বৈসাবি উপলক্ষে প্রকাশ করে। বৈসাবি অনুষ্ঠান সফল করতে বাংলাদেশ সম্পর্কিত এনজিও শাপলানীর তাদের স্বেচ্ছাসেবী, জায়গা, নেটওয়ার্ক ও যানবাহন সুবিধা দিয়ে সহযোগিতা করে।

চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে সাধারণ পাহাড়ি ছাত্রদের "দুই নাম্বারী" প্রতিরোধ

চ.প.ই প্রতিবেদক ॥ ৪ এপ্রিল চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে অধ্যয়নরত পাহাড়ি ছাত্রছাত্রীরা পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন জোরদার করতে পিসিপি'র শাখা কমিটি গঠন করে। এই কমিটি গঠনে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ছিল স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা। ১৫ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটিতে রূপায়ন চাকমাকে সভাপতি, স্বরুপম চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও অখিতা চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

কিন্তু কমিটি যাতে সুষ্ঠুভাবে কাজ চালাতে না পারে সে জন্য সন্তু লারমার বেতনধারী সন্ত্রাসীরা ষড়যন্ত্র শুরু করে। গত ২৩শে মে ২০০২ চঞ্চ, রেবতি, শুভ্রময়, রূপায়ন ও মং নামের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র বেশধারী "দুই নাম্বারী" সদস্য চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের সূর্য্যসেন ছাত্রাবাসে যায় এবং সাধারণ ছাত্রছাত্রীদেরকে দিয়ে একটি "দুই নাম্বারী" পিসিপি কমিটি গঠন করতে বলে। কিন্তু সাধারণ ছাত্ররা চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে কোন "দুই নাম্বারী" কমিটি গঠন করা যাবে না বলে সাফ সাফ জানিয়ে দেয়। সাধারণ ছাত্রদের কথায় ও যুক্তিতে পেরে না উঠলে "দুই নাম্বারীরা" স্বরুপম চাকমাকে হুমকি দিয়ে বলে যে, যদি তারা চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে কমিটি করতে না পারে তাহলে তাকে খাগড়াছড়ি বা রাঙ্গামাটিতে পেলে মেরে ফেলা হবে।

কিন্তু "দুই নাম্বারীদের" এই কথায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ক্ষিপ্ত হয়ে এর প্রতিবাদ জানায় ও এ বক্তব্য প্রত্যাহার করে ক্ষমা চাইতে বলে। পরে সাধারণ ছাত্ররা তাদেরকে গলা ধাক্কা দিয়ে হোস্টেল থেকে বের করে দেয়। অবস্থা বেগতিক দেখে "দুই নাম্বারীরা" পলিটেকনিক ক্যাম্পাস থেকে চোরের মতো পালাতে বাধ্য হয়।

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ-এর চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট শাখার কাউন্সিল সম্পন্ন

নিধান চাকমা ॥ গত ৪ এপ্রিল চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ক্যাম্পাসে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট শাখার কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক প্রমেশ্বর চাকমা (বর্তমানে সভাপতি) ও চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি সোনালী চাকমার উপস্থিতিতে রূপায়ন চাকমাকে সভাপতি, স্বরূপম চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও অতিথা চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি সোনালী চাকমা কমিটিকে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের সামনে উপস্থাপন করলে সকলে জোর করতালির মাধ্যমে নতুন কমিটির নেতৃবৃন্দকে স্বাগত জানান।

পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক প্রমেশ্বর চাকমা তার বক্তব্যে বলেন, নতুন কমিটি মানে নতুন শক্তি। এই নতুন শক্তি জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য পিসিপির আন্দোলন সংগ্রামকে আরো বেগবান করবে। পিসিপি এ সকল শক্তিসমূহকে কেন্দ্রীভূত করে তার আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে নিতে চায়।

সোনালী চাকমাসহ অন্যান্য নেতারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে তার পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারে একমাত্র ছাত্ররা। বক্তারা ছাত্র আন্দোলনের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, ছাত্ররাই জাতির দুঃসময়ে নেতৃত্ব দিয়ে জাতিকে আশার আলো দেখিয়েছে। বক্তারা পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য ছাত্রসমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

বিজ্ঞপ্তি

ইউপিডিএফ-এর সকল ইউনিটসহ পিসিপি ও এইচডব্লিউএফ-এর শাখাসমূহকে স্বাধিকারে রিপোর্ট পাঠানোর জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

লক্ষ্মীছড়িতে পাহাড়ি যুব ফোরাম নেতা আটক, পরে মুক্তি

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ গত ২৮শে জুলাই সেনাসদস্যরা খাগড়াছড়ির লক্ষ্মীছড়ি থেকে পাহাড়ি যুব ফোরামের আহ্বায়ক মানস মুকুল চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ৪ নেতাকে তিন ঘন্টা ধরে থানায় আটক রাখে। পরে স্থানীয় জনগণের দাবি ও প্রবল প্রতিবাদের মুখে ও তাদের বিরুদ্ধে একটি অপহরণ মামলা সাজাতে ব্যর্থ হলে তাদেরকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। সেনারা লক্ষ্মীছড়ি বাজারে অবস্থিত পিসিপি লক্ষ্মীছড়ি থানা শাখার অফিসও তছনছ করে দেয়। আটককৃত পিসিপি নেতারা হলেন কেন্দ্রীয় সহসাধারণ সম্পাদক সুপার জ্যোতি চাকমা ও সর্বোত্তম চাকমা, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক স্বর্ণজ্যোতি চাকমা ও লক্ষ্মীছড়ি থানা শাখার আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সুইথুই মারমা। ঐদিন বিকেল ৩টার দিকে 2-IC শরীফ ও মেজর আনোয়ারের নেতৃত্বে লক্ষ্মীছড়ি সেনা জোন থেকে একদল সেনা সদস্য পিসিপি কার্য্যালয়ে যায়। সেখানে তারা পিসিপি নেতাদের খোঁজ করে। পিসিপি নেতারা তখন লক্ষ্মীছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের প্রাক্তন মেম্বার সুনীতি চাকমার বাড়িতে দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন। তাদেরকে না পেয়ে সেনারা অফিসের কাগজপত্র ও সাজ সরঞ্জাম তছনছ করে দেয়। এরপর তারা পিসিপি নেতাদের গ্রেফতারের জন্য সুনীতি মেম্বারের বাড়ি যায়। পিসিপি অফিস থেকে তার বাড়ি পায়ে হেঁটে ৪/৫ মিনিটে যাওয়া যায়। সেনা সদস্যরা সেখান থেকে তাদেরকে কোন কারণ ও এরেষ্ট ওয়ারেন্ট ছাড়াই তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার করে থানায় চালান দেয়।

তাদেরকে দেখে থানা কর্মকর্তারা জিজ্ঞেস করে কি জন্য তারা থানায় এসেছেন। পিসিপি নেতারা বলেন যে কি জন্য তাদেরকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে তা তারাও জানেন না। পরে সেনাবাহিনী জানায় যে, এলাকায় একটি অপহরণ ঘটনা ঘটেছে, এর সাথে তারা জড়িত থাকতে পারে। সেজন্য তাদের নাম এই অপহরণ মামলায় যুক্ত করতে হবে বলে সেনা জোন থেকে পুলিশকে চাপ দেয়া হয়। সেনা ক্যাম্পের পক্ষ থেকে আরও বলা হয় যে পুলিশ যাতে পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাদেরকে ছেড়ে না দেয়।

কিন্তু পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, তাদের এলাকায় কোন অপহরণ ঘটনা ঘটেছে বলে তাদের জানা নেই এবং কেউ এ ব্যাপারে থানায় মামলা বা ডায়েরী করতে আসেনি। পুলিশ পিসিপি ও পায়ুফো নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে অস্বীকৃতি জানায়। বরং হয়রানির শিকার হওয়ার জন্য তারা দুঃখ প্রকাশ করে।

এদিকে পিসিপি ও পায়ুফো নেতাদেরকে ছেড়ে দেয়ার জন্য স্থানীয় জনগণের চাপ বাড়তে থাকে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা সেনা কর্মকর্তাদের সাথে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হয়। পরে সেনা কর্তারা এলাকার হেডম্যান, কার্বারী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ক্যাম্পে ডেকে পাঠায়। সেনারা তাদের জানায় যে লক্ষ্মীছড়ি বাজারে একটি অপহরণ ঘটনা ঘটেছে এবং এই ঘটনার সাথে যুক্ত থাকার সন্দেহে পিসিপি ও পায়ুফো নেতাদের আটক করা হয়েছে। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা জানায় যে এলাকায় কোন অপহরণ ঘটনা ঘটেছে বলে তারা জানেন না, তবে লক্ষ্মীছড়ি বাজার থেকে একজন পাহাড়ি যুবককে মুরগী চুরির অপরাধে গ্রাম্য সালিশের জন্য ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেনা কর্মকর্তারা ঐ পাহাড়ি যুবককে ক্যাম্পে নিয়ে আসার অনুরোধ জানালে তাকে তৎক্ষণাৎ ক্যাম্পে হাজির করা হয়। ঐ যুবক স্বীকার করে যে তার মদ পানে আসক্তি রয়েছে এবং সে মদ কিনে খাওয়ার জন্য মুরগী চুরি করে। তার এই জবানবন্দি শোনার পরই কেবল সেনা কর্মকর্তারা পিসিপি ও পায়ুফো নেতাদেরকে ছেড়ে দেয়ার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেয়। সন্ধ্যা ৬টার দিকে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। অবশ্য সেনা কর্মকর্তাদের নির্দেশে পুলিশ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে আটককৃতদের কাছ থেকে জোর করে সাদা কাগজে স্বাক্ষর আদায় করে।

পরে জানা যায়, বাজার থেকে গ্রাম্য সালিশের জন্য ঐ মুরগী চোরকে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি একজন সেটেলার বাঙালি আর্মি জোনে রিপোর্ট করে। সেনারা চেয়েছিল এই ঘটনাকে ব্যবহার করে পিসিপি'র ওপর আঘাত হানতে। কারণ পিসিপি লক্ষ্মীছড়িতে অফিস খোলায় সেনাদের একটি অংশ তেমন সন্তুষ্ট নয়।

পিসিপি নেতাদের গ্রেফতারের পর তাদের মুক্তির জন্য চাপ প্রয়োগ করতে রিনা দেওয়ান, সন্ধ্যা চাকমা, সোনা চাকমা ও রতন চাকমা গুরুত্বপূর্ণ ও সাহসী ভূমিকা পালন করে। তারা পিসিপি ও পায়ুফো নেতাদের ছেড়ে দেয়ার দাবিতে সেনাদের সাথে বাকবিতন্ডায় লিপ্ত হয়। এজন্য সেনারা তাদেরকে ভয়ভীতি দেখিয়ে "ঠাণ্ডা" করতে বলে যে তারা যেন পরদিন তাদের "গার্জিয়ানদের" নিয়ে ক্যাম্পে যায়।

২৮ তারিখের ঘটনার পরদিন সকালে আর্মিরা আবার পিসিপি অফিসে হানা দেয় ও প্রাক্তন মেম্বার সুনীতি চাকমার ছেলে ও পিসিপি লক্ষ্মীছড়ি থানা শাখার আহ্বায়ক রতন চাকমাকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে নানাভাবে হয়রানি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়। সেনারা তাকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় হুমকি দিয়ে বলে, "কত বড় নেতা হয়েছ মিছিল করবে?" পরে সেনারা তাকে ছেড়ে দেয়।

বিপুল সংগ্রামী উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পিসিপি'র ১৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ ২০শে মে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। লোমহর্ষক লংগদু গণহত্যার প্রতিবাদ জানাতে ১৯৮৯ সালের এদিন জুম্ম ছাত্রছাত্রীরা একটি সংগঠনের পতাকাতলে সমবেত হয়। জন্ম নেয় বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের লড়াই সংগ্রামে যোগ হয় নতুন মাত্র। প্রতিষ্ঠার পর থেকে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদকে অনেক চড়াই উতরাই পেরোতে হয়েছে। একদিকে যেমন সরকার-সেনাবাহিনীর বর্বর দমন পীড়ন ও অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নেতৃত্ব দিতে হয়েছে, তেমনি সংগঠনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা রঙ বেরঙের সুবিধাবাদী ও সরকারী চরদেরকেও মোকাবিলা করতে হয়েছে। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্যান্য লড়াকু সংগঠনের সাথে তাল মিলিয়ে সন্তু লারমার আত্মসমর্পনের দলিল তথাকথিত শান্তিচুক্তিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে জনগণের মুক্তির একমাত্র সনদ পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের জন্য লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

এবার ছিল পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ১৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ এই দিনটি বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়। র‍্যালি, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে জাতীয় রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীগণ পিসিপি'র এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ন্যায়সংগত আন্দোলনের সাথে সংহতি প্রকাশ করেন।

সকাল ১১টায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শহীদ মংশে মারমার পিতা কংজরী মারমা। তিনি বলেন, জনগনের মহান কাজ করতে যেয়ে তার ছেলে শহীদ হওয়ায় তিনি গর্বিত। বর্তমান সময়ে ছাত্র ও তরুণ সমাজের ঐতিহাসিক দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, যারা এখন তরতাজা তরুণ যুবক তারাই পারে জনগণের মধ্যে আশার আলো জ্বালিয়ে দিতে পারে। তারাই আন্দোলনে জোরদার ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি পিসিপির ১৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও সম্মেলনের সফলতা কামনা করেন।

এরপর সংহতি বক্তব্য রাখেন, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি হাসান ইমাম রুবেল, সাঁওতাল ছাত্রদের এক জন প্রতিনিধি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ইলিরা দেওয়ান। বক্তাগণ সরকার ও জনসংহতি সমিতির কঠোর সমালোচনা করেন এবং জনগণের ন্যায্য দাবি পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন।

সাড়ে এগারটায় শুরু হয় র‍্যালি। র‍্যালিটি স্বনির্ভর থেকে শুরু হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার ও শাপলা চত্বর ঘুরে আবার স্বনির্ভর মাঠে এসে শেষ হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ৭ শতাধিক নেতা কর্মি ও সমর্থক এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন।

বিকেল সাড়ে ৪টায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি মিল্টন চাকমার সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের আহ্বায়ক আ.ফ.ম. মাহবুবুল হক, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের নেতা ও লেখক শিবিরের সাধারণ সম্পাদক হাসিবুর রহমান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক নাসিমা আখতার হোসাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. আকমল হোসেন, বিশিষ্ট প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী করিম আবদুল্লাহ ও ইউপিডিএফ নেতা অনিমেষ চাকমা। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক মেঘনা গুহ ঠাকুরতা তার সংহতি বক্তব্য লিখে পাঠান।

আলোচনা সভা শেষে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কাউন্সিল ও নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন:

২১মে বিকেলে নারাঙহিয়ার পাইওনিয়ার ক্লাবে পিসিপির কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। পিসিপি সভাপতি মিল্টন চাকমা এতে সভাপতিত্ব করেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কমিটি সহ পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিরা কাউন্সিলে অংশগ্রহণ করেন। প্রথম অধিবেশনে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ইলিরা দেওয়ান, নেচার চাকমা, মিঠুন চাকমা, অন্তরিকা চাকমা, কহ্লোচিং মারমা ও রূপন চাকমা (রাজশাহী) বক্তব্য রাখেন। সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন প্রমেশ্বর চাকমা। প্রতিনিধিগণ স্ব স্ব এলাকার পরিস্থিতিসহ সংগঠনের বিভিন্ন দিক নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন।

পরে প্রমেশ্বর চাকমাকে সভাপতি, মিঠুন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও স্বর্ণজ্যোতি চাকমাকে সাংগঠনকি সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, সহসভাপতি বেনজিন চাকমা (ঢাবি) ও বিপ্লব বিজয় চাকমা (চবি), সহসাধারণ সম্পাদক সর্বোত্তম চাকমা (চবি), স্বপন কুমার চাকমা (খাগড়াছড়ি), সুপারজ্যোতি চাকমা (ঢাকা), অর্থ সম্পাদক দীপংকর ত্রিপুরা (ঢাকা), দপ্তর ও ডক্যুমেন্টেশন সম্পাদক রূপন চাকমা (ঢাবি), তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক অলকেশ চাকমা (চবি), শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক রূপন চাকমা (রাবি), সদস্য কহ্লোচিং মারমা (মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি), রিপন চাকমা (ঢাবি), অংশি মারমা (বান্দরবান), সন্তোষ চাকমা (চবি), সুপ্রীম চাকমা (চট্টগ্রাম), ক্যজাই মারমা ও দেবাশীষ চাকমা (চবি)।

পাহাড়ি যুবকদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে পাহাড়ি যুব ফোরাম গঠিত

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাহাড়ি যুব সমাজকে সংগঠিত করতে পাহাড়ি যুব ফোরাম নামে একটি যুব সংগঠনের আবির্ভাব ঘটেছে। গত ৫ মে বন্দর নগরী চট্টগ্রামে পাহাড়ি তরুণ যুবকদের এক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এই সংগঠন জন্ম লাভ করে। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় শ' খানেক যুবক এতে অংশগ্রহণ করেন।

দু'দিনের সম্মেলন শেষে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। এর আহ্বায়ক হলেন মানস চাকমা ও সদস্য সচিব দীলিপ চাকমা। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন রিক্তন চাকমা, চম্পানন চাকমা, দীপংকর চাকমা, প্রভু রঞ্জন চাকমা, কহ্লা চিং মারমা, দেবদত্ত ত্রিপুরা ও দীপালো চাকমা।

চলমান ইউপিডিএফ ও জেএসএস-এর দ্বন্দ্বের বাইরে একটি নিরপেক্ষ সংগঠন হিসেবে পাহাড়ি যুব ফোরাম কাজ করবে বলে এ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন। তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল সমস্যার পাশাপাশি পাহাড়ি যুব সমাজের বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান। সঠিক কর্মসংস্থানের অভাবে পাহাড়ি যুব সমাজের একটি অংশ গাঁজা, ফেনসিডিল ও হিরোইনের মত ভয়ানক মাদকে আসক্ত হচ্ছে, আর অপর একটি অংশ উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার পরও বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে জীবন যাপন করছে। ইচ্ছে ও যোগ্যতা থাকা সত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের প্রতিকূল প্রশাসনিক পরিস্থিতির কারণে তারা আত্মকর্মসংস্থান করতে পারছে না কিংবা

৩য় পাতায় দেখুন

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) -এর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। সম্পাদকীয় যোগাযোগ: ৩৮৮ পূর্ব বাড়ী, জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা